আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়---(১) আকাশে ধূম্র দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশরিকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য আযাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারটি মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কোরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধূম্র কিয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের তফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে কাসীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তফসীরে বাহ্যত খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ---অথচ কিয়ামতে কাফিরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে---এক. উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে।

কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ---অন্য এক আয়াতে আছে وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كشف عذاب -এর মানে যদিও আযাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে; কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আ)-এর কওমের

ব্যাপারেও এমনিভাবে। إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আযাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল। একেই كشف عذاب বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কিয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোন খটকা দেখা দেয় না এবং এ তফসীর অনুযায়ী يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ—এর অর্থ হবে কিয়ামত দিবসের পাকড়াও। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, কিয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফিরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরপর তাদের উপর যে-কোন আযাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে মসউদ থেকে বর্ণিত আছে ঃ

هما دخانان مضى واحد و الذى بقى يملا ما بين السماء و الارض و لايصيب المؤمن الا بالزكمة و اما الكافر فيشق مسامعه فيبعث الله عند ذالك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن و يبقى شرار الناس -

ধূম্র দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়)। আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মু'মিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফিরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মু'মিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফিরকুল অবশিষ্ট থাকবে।---(রূহুল মা'আনী)

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়াতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তফসীরের কোন বৈপরীত্য থাকে না।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَنْ
اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾ وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا
عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّىْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾ وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ
وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾
فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا
اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾
كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾
وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا
اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا
مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ
الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾
وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ
مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾

(১৭) তাদের পূর্বে আমি ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, (১৮) এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল (১৯) আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি। (২১) তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। (২২) অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় (২৩) তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের

পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা নিমজ্জিত বাহিনী! (২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, (২৬) কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান, (২৭) কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। (২৮) এমনিই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (২৯) তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। (৩০) আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। (৩১) ফিরাউন—সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। (৩২) আমি জেনেশুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের আগে ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং (পরীক্ষা ছিল এই যে,) তাদের কাছে আগমন করেছিলেন একজন সম্মানিত রসূল [অর্থাৎ মূসা (আ)] পয়গম্বরের আগমনে কে ঈমান আনে এবং কে আনে না, তার পরীক্ষা হয়। তিনি এসে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল, যাদেরকে তোমরা নিপীড়ন করছ,) আমার কাছে প্রত্যর্পণ কর (এবং তাদের থেকে হাত গুটাও। আমি যেখানে ও যেভাবে পারি তাদেরকে মুক্ত করে রাখব।) আমি (তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত) রসূল (হয়ে এসেছি এবং ওহী হুবহু পৌঁছাই। কাজেই তোমাদের মানা উচিত।) তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য করো না। (উপরে বান্দার হক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল এবং এখানে আল্লাহ্‌র হক সম্বন্ধে বলা হয়েছে।) আমি তোমাদের সামনে (আমার নবুয়তের) স্পষ্ট দলীল পেশ করছি। (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা। কিন্তু ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় মানল না এবং তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করল। তিনি শুনে বললেন,) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি। তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে আলাদা থাক (অর্থাৎ আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করো না। কারণ, আমার তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন لَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا কিন্তু তোমাদের অপরাধ আরও গুরুতর হয়ে যাবে। তাই এরূপ করো না। কিন্তু তারা মানবার পাত্র ছিল না।) তখন মূসা (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন, এরা বড় অপরাধী সম্প্রদায়। (অপরাধ থেকে বিরত হয় না। কাজেই তাদের ফয়সালা করে দিন। আমি দোয়া কবুল করলাম এবং বললাম,) তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রি বেলায় বের হয়ে পড়। (কেননা, ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (তাই রাত্রি বেলায় বের হলে দূরে যেতে পারবে। ফলে তারা তোমাদেরকে ধরতে পারবে না। চলার পথে যে সমুদ্র পড়বে,) তুমিই (সেই)

সমুদ্রকে (প্রথমে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে, এবং তাতে সে শুষ্ক হয়ে পথ দেবে। অতপর পার হওয়ার পর তাকে তদবস্থায় দেখে চিন্তা করো না যে, ফিরাউনও সম্ভবত পার হয়ে যাবে। বরং তুমি তাকে) অচল থাকতে দেবে (এবং নিশ্চিন্ত থাকবে। তাকে অচল থাকতে দেওয়ার রহস্য এই যে,) তাদের সমস্ত বাহিনী (এ সমুদ্রে) নিমজ্জিত হবে। [তারা সমুদ্রকে অচল দেখে তাতে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করার পরই সমুদ্র চলমান হয়ে যাবে এবং দুদিক থেকে পানি এসে মিলে যাবে। সেমতে তাই হয়েছিল। মূসা (আ) পার হয়ে গেলেন এবং ফিরাউন ও তার বাহিনী তাতে নিমজ্জিত হল।] তারা ছেড়ে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা আনন্দিত থাকত। (এ ঘটনা) এরূপই হয়েছিল এবং আমি ভিন্ন সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) এগুলোর মালিক করে দিলাম। (যেহেতু তারা খুব ঘৃণিত ছিল, তাই) তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি এবং তারা (আযাব থেকে) অবকাশও পায়নি। (অর্থাৎ আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে জাহান্নামের আযাব থেকে আরও কিছুদিন অবকাশ পেত।) আমি (এভাবে) বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক আযাব থেকে উদ্ধার করেছি (অর্থাৎ ফিরাউন থেকে। তার অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে।) নিশ্চয় সে (দাসত্বের) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। আমি বনী ইসরাঈলকে (আরও নিয়ামত দিয়েছি এবং) জেনেশুনে তাদেরকে (কোন কোন ব্যাপারে) বিশ্বাসীদের উপর (অথবা সকল ব্যাপারে তখনকার লোকদের উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সেসব নিয়ামত ও পুরস্কার তো ছিলই, আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনও ছিল বটে। অর্থাৎ আমি তাদের এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে স্পষ্ট পুরস্কার ছিল। (অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুগ্রহের পুরস্কারও ছিল এবং আমার কুদরতের দলীলও। তন্মধ্যে ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামত। যেমন, ফিরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করা। আর কিছু ছিল অপ্রকাশ্য। যেমন, জ্ঞান, কিতাব ও মু'জিযা দর্শন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ---(তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না করে, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।) رجم শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা, ফিরাউনের সম্প্রদায় মূসা (আ)-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا---(সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।)

মূসা (আ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র

পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফিরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না ---যাতে ফিরাউন শুষ্ক ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।---(ইবনে কাসীর)

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ---(আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তফসীরে এর জওয়াবও দেওয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ---(অতপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোন সৎকর্ম আকাশেও পৌঁছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি দ্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। এক দ্বার দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পৌঁছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেন। ইবনে আব্বাস থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।---(ইবনে কাসীর) শোরায়াহ্ ইবনে ওবায়দ (রা)-এর অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন যে মু'মিন ব্যক্তির জন্য কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাফিরের জন্য ক্রন্দন করে না।---(ইবনে জরীর) হযরত আলী (রা)-ও সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বোঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য ছিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতপ্ত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েত-দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক

রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ---আধুনিক বিজ্ঞানও ক্রমান্বয়ে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরী নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ---(আমি বনী ইসরাঈলকে জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) এতে উম্মতে মুহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কোরআনে হযরত মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلَىٰ عِلْمٍ (জেনেশুনে)-এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ---(আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে প্রকৃষ্ট পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। শব্দের দু'অর্থ---পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর।---(কুরতুবী)

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِمُنْشَرِينَ ۝ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ
إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۝ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ
مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ
اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٨﴾

(৩৪) কাফিররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সবকিছুর অবসান হবে এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, (৪১) যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিয়ামতের শাস্তির কথা শুনে কিয়ামত অস্বীকার করে এবং) বলে, দুনিয়ার মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হব না। (অর্থাৎ পরকালীন জীবন বলতে কিছুই নেই)। দুনিয়ার জীবনের পর কিছুই হবে না। (অতএব হে মুসলমানগণ,) তোমরা (পরকাল সম্পর্কিত দাবিতে) সত্যবাদী হলে (অপেক্ষা সয় না, এখনই) আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে আস। (অতপর তাদেরকে এ মর্মে শাসানো হয়েছে যে, তাদের চিন্তা করা উচিত,) তারা (শৌর্যবীর্যে) শ্রেষ্ঠ, না (ইয়ামেন সম্রাট) তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? (যেমন, আদ, সামূদ ইত্যাদি। তারা অধিক উন্নত ছিল, কিন্তু) আমি তাদেরকে (ও) ধ্বংস করে দিয়েছি---(কেবল এ কারণে যে,) তারা ছিল অপরাধী। (কাজেই এরা অপরাধে বিরত না হয়ে কেমন করে বাঁচতে পারবে? অতপর কিয়ামতের সত্যতা ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে।) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি, (বরং) আমি উভয়কে (অন্যান্য সৃষ্টিসহ) যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (যেমন, এগুলো দ্বারা একে তো আল্লাহ্র কুদরত বোঝা যায়, দ্বিতীয়ত প্রতিদান ও শাস্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।) তাদের অধিকাংশ বোঝে না (যে, যিনি এমন

বিশাল আকাশ ও পৃথিবী প্রভৃতিকে প্রথমে সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম।) নিশ্চয় ফয়সালার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) এদের সকলের (পুনরুত্থান ও শাস্তি-প্রতিদানের) নির্ধারিত সময় (যা যথাসময়ে অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতপর কিয়ামতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।) যে দিন কোন সম্পর্কশালী কোন সম্পর্কশালীর উপকারে আসবে না এবং (অন্য কোন তরফ থেকে, যেমন মিথ্যা উপাস্যদের তরফ থেকে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার জন্য আল্লাহ্র অনুমতিতে কৃত সুপারিশ কাজে আসবে এবং আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী হবেন। তিনি (আল্লাহ্) পরাক্রমশালী (কাফির-দেরকে শাস্তি দেবেন), দয়াময় (মুসলমানদের প্রতি দয়া করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ---(তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।) এই আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট বিধায় কোরআন পাক এর কোন জওয়াব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায় ?---(বায়ানুল-কোরআন)

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা ঃ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ---(তারা শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ?) কোরআনে দু'জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে---এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে---কোন বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করে-ছেন যে, এরা কোন্ জনগোষ্ঠী ? বাস্তবে তুব্বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামেনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই تُبَّع শব্দের বহুবচন تَبَابِعَة ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবেয়ায়ে-ইয়ামেন' বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বোঝানো হয়েছে, এসম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাসীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট বোঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আবূ কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব। যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা

করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দু'জন ইহুদী আলিম তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না; কারণ এটা শেষ পয়গম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদী আলিমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়। সূরা সাবায় এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ---(ইবনে কাসীর) এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়েছিল। একারণেই কোরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে; শুধু তুব্বা উল্লিখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, لا تسبوا تبعا فانه قد اسلم তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ---(আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।) উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদ্‌ঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের পরিপন্থী। চতুর্থত সৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾
كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا

فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝ ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْكَرِيْمُ ۝ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ
فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ
وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ ۖ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝
يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ
إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝

(৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; (৪৫) গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে (৪৬) যেমন ফুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, (৪৮) অতপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও, (৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত! (৫০) এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (৫১) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে —(৫২) উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। (৫৪) এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (৫৮) আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৫৯) অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (সূরা ছাফফাতে এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) বড় পাপীর (অর্থাৎ কাফিরের) খাদ্য হবে, যা (দৃষ্টিকটু হওয়ার ব্যাপারে) তেলের তলানির মত হবে এবং ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। ফেরেশতাগণকে (আদেশ

করা হবে) একে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও, অতপর এর মস্তকের উপরে যন্ত্রণাদায়ক ফুটন্ত পানি ঢাল। (তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলা হবে এবার) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড় সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ! (এটা তোমার সম্মান, যেমন তুমি দুনিয়াতে নিজেকে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত মনে করে আমার আদেশ পালনে লজ্জাবোধ করতে। জাহান্নামীদেরকে বলা হবে,) এ সম্পর্কেই তোমরা সন্দেহ পোষণ (ও অস্বীকার) করতে। (অতপর জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে অর্থাৎ উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র পরিধান করবে, সামনাসামনি বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে সুন্দরী আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তথায় তারা নিশ্চিত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। তথায় দুনিয়ার মৃত্যু ব্যতীত তারা মৃত্যু আস্বাদন করবে না (অর্থাৎ অমর হয়ে থাকবে)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। এসবই হবে আপনার পালনকর্তার কৃপায়। এটাই মহাসাফল্য। (হে পয়গম্বর, আপনার কাজ শুধু তাদেরকে বলে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যেই) আমি কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা (একে বোঝে) উপদেশ গ্রহণ করে। অতএব (ওরা না মানলে) আপনি (এদের উপর বিপদ অবতরণের) অপেক্ষা করুন। তারাও (আপনার উপর বিপদ অবতরণের) অপেক্ষা করছে। (কাজেই আপনি দুঃখ ও চিন্তা না করে তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন। তিনি নিজেই বুঝে নেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কোরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ—যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা ছাফফাতে কিছু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কুম কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ—থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نُزُل—বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضِيَافَة—অথবা مَادُبَة বলা হয়! কোরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে

পরে জাহান্নামে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল ; কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরও লাঞ্ছিত ও কষ্টদানের জন্য জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।---(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ كَرِيمٍ---এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামত-সমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি---(১) উত্তম বাসগৃহ (২) উত্তম পোশাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (৪) সুস্বাদু খাদ্য (৫) এসব নিয়া-মতের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতীদের জন্য প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের প্রধান গুণ।

سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ---এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র।

تزويج---زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ-এর অর্থ এককে অন্যের যুগল করে দেওয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতী পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর জন্য দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ- ---অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যও। কিন্তু সেটা তাদের জন্য অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্য অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নিয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে।

سورة الجاثية

সূরা জাসিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ
دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٤ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٥ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦
وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٧ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨ وَاِذَا عَلِمَ
مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٩
مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا
مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٠ هٰذَا
هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝١١

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম, (২) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। (৩) নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪) আর

তোমাদের সৃষ্টিতে এবং বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিযিক বর্ষণ করেন অতপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এগুলো আল্লাহ্র আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথ রূপে। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ। (৮) সে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে, অতপর অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত শুনেনি। অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৯) যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১১) এটা সৎপথ প্রদর্শন, আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন)। এটা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। (অতএব এর বিষয়বস্তু মনোযোগ দিয়ে শুনা দরকার। এখানে এক বিষয়বস্তু তওহীদ) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মু'মিনদের (প্রমাণ গ্রহণের) জন্য (কুদরত ও তওহীদের) অনেক নিদর্শন রয়েছে। (এমনিভাবে) তোমাদের সৃজনে এবং (পৃথিবীতে) বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুর সৃজনেও প্রমাণাদি রয়েছে বিশ্ববাসীদের জন্য। (এমনিভাবে) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে রিযিক (অর্থাৎ রিযিকের উপকরণ) বর্ষণ করেন, অতপর তদ্দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং (এমনিভাবে) বায়ুর পরিবর্তনে (বায়ু কোন সময় পূবালী, কোন সময় পশ্চিমা, কোন সময় গরম এবং কোন সময় শীতল হয়। মোটকথা এসব বিষয়ে) নিদর্শনাবলী রয়েছে (সুস্থ) বিবেকবানদের জন্য। (এটা যে তওহীদের প্রমাণ, তা দ্বিতীয় পারায় إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়বস্তু নবুয়তের প্রমাণ এভাবে যে,) এগুলো আল্লাহ্র আয়াত, যা আমি যথাযথ রূপে আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাই। (এতে নবুয়ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু এতবড় অলৌকিক প্রমাণ সত্ত্বেও যদি তারা না মানে তবে) আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা (এর চেয়ে বড়) কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (তৃতীয় বিষয়বস্তু পরকাল, যেখানে সত্য বিরোধীদের শাস্তি হবে) প্রত্যেক (বিশ্বাস সম্পর্কিত কথাবার্তায়) মিথ্যাবাদী (এবং কর্মে) পাপাচারীর জন্য দুর্ভোগ। যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে অতপর অহংকারী হয়ে (স্বীয় কুফরে) অটল থাকে, যেন সে শুনেনি। অতএব তাকে

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (সে এমন দুষ্ট যে,) যখন সে আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে (পরকালে) অপমানকর আযাব। (উদ্দেশ্য এই যে, যেসব আয়াত তিলাওয়াত শুনে এবং যে সব আয়াত এমনিতে অবগত হয়, সবগুলোকে মিথ্যা মনে করে।) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা উপার্জন করেছে (অর্থাৎ ধনসম্পত্তি ও কর্ম) তা তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারাও (উপকারে আসবে না) যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (কারণ এই যে,) এই কোরআন আদ্যোপান্ত পথ নির্দেশক। (ফলে) যারা তাদের পালনকর্তার (এসব) আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে, قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ আয়াতখানি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলীলাদি, কাফিরদের সন্দেহ ও বেদ্বীনদের খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ—এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্যান পাঠকবর্গ ইমাম রাযীর তফসীরে কবীরে দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তওহীদের দলীল। এই বিশ্বাস কোন না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মু'মিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বুদ্ধির

অধিকারী। কারণ, সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নির্দর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেককে কষ্ট দেয়া পছন্দ করে না, তাদের সামনে হাজারো দলীল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ---(মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য ভীষণ দুর্ভোগ)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ্ সম্পর্কে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়।---(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ---একজন হোক অথবা তিন জন।

مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ---শব্দটি আরবীতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশি এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। তফসীরের সার সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। যারা 'পেছনে' অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন-যাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ পরে জাহান্নাম আসছে।---(কুরতুবী)

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ
یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ
اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَیْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

(১২) তিনি আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর কৃতজ্ঞ হও। (১৩) এবং অধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা আছে নভো-

মণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে, তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী হয়েছে। (১৪) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। (১৫) যে সৎকাজ করে, সে নিজ স্বার্থেই তা করে, আর যে অসৎ কাজ করে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদের (উপকারের) জন্য সমুদ্রকে (কুদরতের) অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে নৌকা চলাচল করে এবং যাতে (এসব নৌকায় সফর করে) তোমরা তাঁর (দেয়া) রুযী তালাশ কর ও যাতে (রুযী লাভ করে) তোমরা শোকর কর। (এমনিভাবে) যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে তার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ তাঁর আদেশক্রমে) অধীন করে দিয়েছেন, (যাতে তোমাদের উপকারের কারণ হয়।) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য (কুদরতের) দলীল রয়েছে। (কাফিরদের দুষ্টুমি দেখে মাঝে মাঝে মুসলমানদের মধ্যে ক্রোধ দেখা দিত। অতপর তাদেরকে মার্জনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।) আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদির প্রতি (অর্থাৎ পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির) বিশ্বাস রাখে না, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তাদের (এই সৎ) কর্মের (উত্তম) প্রতিফল দেন। (কেননা, আল্লাহ্‌র নীতি এই যে,) যে সৎকাজ করে, সে নিজ স্বার্থের (অর্থাৎ সওয়াবের) জন্য করে, আর যে অসৎ কাজ করে, তার শাস্তি তার উপর বর্তাবে। অতপর (সৎ ও অসৎ কাজ করার পর) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সেখানে তোমাদেরকে তোমাদের ভাল কর্ম ও চরিত্রের উত্তম প্রতিদান এবং তোমাদের শত্রুদেরকে তাদের কুফর ও কুকর্মের গুরুতর শাস্তি দেয়া হবে। কাজেই এখানে ক্ষমা করাই তোমাদের উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ - - - وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ---কোরআন

পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে

জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজ সম্পদ এবং ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ —(আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরিক হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত উমর এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবিগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত উমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ্ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ বাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটাতাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত উমর (রা) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহ্‌র দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ।---(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী) সনদ খোঁজাখুঁজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ্ প্রমাণিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাযিল হয়েছিল, অতপর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি সেখানেও তিলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, জিবরাঈল (আ) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার (বারবার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে اَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারাদি। اَيَّام শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবীতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরিকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত

হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আযাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধরপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজকারবারে ছোটখাট বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা ঠিক নয়, বিশেষত এর শানে নুযূল যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ, জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦ وَاٰتَيْنٰهُمْ
بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ
بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا
فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝١٧ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٨ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ
اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ
وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝١٩ هٰذَا بَصَاۗىِٕرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٢٠

(১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (১৭) আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে

দেবেন। (১৮) এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। (১৯) আল্লাহ্‌র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্ পরহিযগারদের বন্ধু। (২০) এটা মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, একে অস্বীকার করতে হবে। সেমতে এর আগে) আমি বনী ইসরাঈলকে (ঐশী) কিতাব, প্রজ্ঞা (অর্থাৎ বিধানাবলীর জ্ঞান) ও নবুয়ত দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছিলাম) এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন বস্তু খাওয়ার জন্য দিয়েছিলাম (তীহ্ প্রান্তরে মান্না ও সালওয়া নাযিল করে এবং ভূ-জাত কল্যাণের ভাণ্ডার শাম দেশের অধিপতি করে) এবং (কোন কোন বিষয়ে, যেমন সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও মেঘের ছায়া দান করা ইত্যাদি বিষয়ে) বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে দীনের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম, (অর্থাৎ তাদেরকে প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিয়েছিলাম।) অতপর (পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত ছিল, কিন্তু) তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। (দ্বিতীয় পারায় এ সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই, যে জ্ঞানের সাহায্যে মতভেদ দূর করা উচিত ছিল, সে জ্ঞানকেই তারা মতভেদের কারণ বানিয়ে নিল। অতএব) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার (কার্যত) ফয়সালা করে দেবেন। এরপর (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলে নবুয়ত খতম হওয়ার পর) আমি আপনাকে (নবুয়ত দান করেছি এবং) দীনের এক বিশেষ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি এরই অনুসরণ করুন (অর্থাৎ কর্মেও প্রচারেও) এবং মূর্খদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না (অর্থাৎ তাদের কামনা এই যে, আপনি তবলীগ না করুন। তারা আপনাকে উত্ত্যক্ত করে, যাতে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে তবলীগ পরিত্যাগ করেন। অতপর এই আদেশের কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে,) তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় আপনার কোন উপকারে আসবে না। (কাজেই তাদের অনুসরণ যেন না হয়।) জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) একে অপরের বন্ধু (এবং একে অপরের কথা মানে।) আর আল্লাহ্ পরহিযগারদের বন্ধু (পরহিযগাররা তাঁর কথা মানে। সুতরাং আপনি যখন পরহিযগারদের নেতা, তখন আল্লাহ্‌র অনুসরণই আপনার কাজ—তাদের অনুসরণ নয়। মোটকথা, আপনি নবুয়ত ও শরীয়তের অধিকারী আর) এই কোরআন (যা আপনি পেয়েছেন) সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা ও হিদায়তের উপায় এবং বিশ্বাসী (অর্থাৎ মু'মিনদের) জন্য রহমত (-এর কারণ)।

অনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ—এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়—এক. বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমর্থন এবং দুই. তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোন ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না।—(বয়ানুল কোরআন)

পূর্ববর্তী উম্মতদের শরীয়তের বিধান আমাদের জন্য: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরীকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক ও অভিন্ন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গম্বরের শরীয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই "ধর্মের এক বিশেষ তরীকা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। একারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধানাবলীই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলী কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোরআন পাক অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কোন বিধান প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরীয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসাবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

(২১) যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে---এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ! (২২) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কিয়ামতে অস্বীকারকারীরা) যারা দুষ্কর্ম (অর্থাৎ কুফর ও শিরক) করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? (অর্থাৎ মু'মিনদের জীবন ও মৃত্যু কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা কোন আনন্দ উপভোগ করেনি, মৃত্যুর পরও আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে? এমনিভাবে কাফিরদের জীবন ও মৃত্যুও কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা আযাব ও কষ্ট থেকে বেঁচে রয়েছে, মৃত্যুর পরও তেমনি নিরাপদ থাকবে? উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল অস্বীকার করলে এটা জরুরী হয়ে পড়ে যে, আনুগত্যশীলরা তাদের আনুগত্যের ফল পাবে না এবং বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের বিরোধিতার শাস্তিও ভোগ করবে না।) কত মন্দ এ ফয়সলা! আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। (এক প্রজ্ঞা তো এই যে, এসব মহাসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝে নেবে যে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি ধ্বংসের পর এগুলো পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। ফলে কিয়ামত ও পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় প্রজ্ঞা এই যে,) যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল লাভ করে। (এটা সবাই জানে যে দুনিয়াতে পূর্ণ ফল নেই, তাই পরকাল থাকা জরুরী। এই ফল দেওয়ার ব্যাপারে) তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য ঃ উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফির ও পাপাচারীরা

অঢেল ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমত দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধে পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়ালখুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধনসম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকুরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই—যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও; কিন্তু দুনিয়াতে এর কোন প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব সাধুতা ও অসাধুতায় পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেওয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভাল ও মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ---আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন—প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ
عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ
بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا ائْتُوا
بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

(২৩) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহ্র পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না? (২৪) তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। (২৫) তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতপর মৃত্যু দেন, অতপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদ ও পরকালের এই সুস্পষ্ট বর্ণনার পর) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? (অর্থাৎ মন যা চায়, তারই অনুসরণ করে।) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জ্ঞানবুদ্ধি সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট

করেছেন (অর্থাৎ সত্যকে শোনা ও বোঝার পরেও সে খেয়ালখুশির অনুসরণে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।) তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। (অর্থাৎ প্রবৃত্তিপূজার কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা স্তিমিত হয়ে গেছে।) অতএব আল্লাহ্‌র (পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার) পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? (এতে সান্ত্বনাও রয়েছে। অতপর কাফিরদেরকে বলা হয়েছে,) তোমরা কি (এসব বর্ণনা শুনেও) বুঝ না? (তারা বোঝত, কিন্তু উপকারী বোঝা বোঝত না।) তারা (অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকারকারীরা) বলে, আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত কোন (পারলৌকিক) জীবন নেই। আমরা (এক মৃত্যুই) মরি ও (এক বাঁচাই) বাঁচি। (অর্থাৎ মৃত্যুর মত জীবনও দুনিয়াতেই সীমিত।) মহাকালই (অর্থাৎ মহাকালের চক্রই) আমাদেরকে ধ্বংস করে। (অর্থাৎ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে দৈহিক শক্তিও ক্ষয় পেতে থাকে এবং স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু আসে। এমনিভাবে জীবনের কারণও স্বাভাবিক বিষয়াদি। এসব স্বাভাবিক বিষয় পরকালের মুখাপেক্ষী নয় বিধায় পরকালীন জীবন নেই।) তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই, তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (অর্থাৎ পরকালীন জীবন না হওয়ার কোন দলীল নেই এবং সত্যপন্থীদের দলীলের কোন জওয়াবও তারা দিতে পারে না।) যখন (এ সম্পর্কে) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (যা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে যথেষ্ট,) তখন এ কথা বলা ছাড়া তাদের কোন জওয়াব থাকে না যে, তোমরা (এ দাবিতে) সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে এস। আপনি (জওয়াবে) বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (যতদিন ইচ্ছা,) জীবিত রাখেন, অতপর (যখন চাইবেন) মৃত্যু দেবেন। এরপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে (জীবিত করে,) একত্র করবেন, যাতে (অর্থাৎ যার বাস্তবতায়) কোন সন্দেহ নেই। (সুতরাং সে দিন জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াতে মৃতকে জীবিত না করলে সেটা না হওয়া জরুরী হয় না।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না (এবং প্রমাণ ছাড়াই সত্যকে অস্বীকার করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ ——(অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে—) বলা বাহুল্য, কোন কাফিরও তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কোরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মুকাবিলায় অন্য কারও আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের পরওয়া করে না, আল্লাহ্ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহ্‌র আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়াল-খুশির অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে

উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশিই তার উপাস্য। জনৈক সাধক কবি নিম্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টিই বর্ণনা করেছেন ঃ

سوده گشت از سجده راه بتان پیشانیم
چند برخود تهمت دین مسلمانی نهم

এতে খেয়ালখুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি খেয়ালখুশিকে স্বীয় ইমাম ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে খেয়ালখুশিই যেন তার প্রতিমা। হযরত আবূ ওমামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়ালখুশি। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়ালখুশিকে বশে রেখে পরকালের জন্য কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়ালখুশির পেছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহ্র কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী (র) বলেন, তোমাদের খেয়ালখুশি তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়ালখুশির বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক। —(কুরতবী)

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ — دهر—শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনও দীর্ঘ সময় কালকে دهر বলা হয়। কাফিররা দলীলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহ্র আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ, কোন খোদায়ী আদেশে নয়। বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় ঃ কাফির ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করতে এবং সবকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিররা যে শক্তিকে দহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ্ তা'আলারই। তাই দহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মহাকালকে গালি দিও না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাকাল আল্লাহ্ই। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোন

কিছু নয়। এতে জরুরী হয় না যে, দহর আল্লাহ্ তা'আলার কোন নাম হবে। কেননা হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ্ তা'আলাকে দহর বলা হয়েছে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ
الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى
كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ
عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ
رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫ اَفَلَمْ
تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾
وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا
قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ
بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ
لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ
بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ
السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

(২৭) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। (৩১) আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। (৩২) যখন বলা হত, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কিয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাস স্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। (৩৫) এটা এ জন্য যে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না। (৩৬) অতএব বিশ্ব-জগতের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা ও নভোমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহ্‌রই প্রশংসা। (৩৭) নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একত্র করবেন, একে কঠিন মনে করা উচিত নয়। কেননা,) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই (তিনি যা ইচ্ছা করেন। কাজেই মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করাও তাঁর জন্য কঠিন নয়)। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি (সেদিন) প্রত্যেক দলকে (ভয়ে) নতজানু অবস্থায় দেখবেন। প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার (হিসাবের) দিকে আহবান করা হবে। (আহবান করার অর্থ তাই। নতুবা আমলনামা তো তাদের কাছেই থাকবে। তাদেরকে বলা হবে,) আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। (আরও বলা হবে,) এটা আমার (লেখানো) আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য বলছে (অর্থাৎ তোমাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশ করছে।) তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে, আমি (ফেরেশতা দ্বারা) তা লিপিবদ্ধ করাতাম। (এটা সেগুলোরই সমষ্টি।) অতপর (হিসাবের ফয়সালা এই হবে যে,) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয়

রহমতে দাখিল করবেন। এটা প্রকাশ্য সাফল্য আর যারা কুফর করেছে, (তাদেরকে বলা হবে,) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হত না? কিন্তু তোমরা (সেগুলো মেনে নিতে) অহংকার করেছিলে এবং (এ কারণে) তোমরা ছিলে অপরাধী। যখন (তোমাদেরকে) বলা হত, (পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কিত) আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা (তাচ্ছিল্য ভরে) বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কি? (কেবল শুনে শুনে) আমরা নিছক ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (তখন) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। (তাদেরকে) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত করব, (অর্থাৎ রহমত থেকে বঞ্চিত করব) যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতে বিস্মৃত হয়েছিলে। (আজ থেকে) তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল (তাতে মশগুল হয়ে পরকাল থেকে গাফিল বরং পরকাল স্বীকারই করতে না।) সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না, (অর্থাৎ তওবা করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। এসব বিষয়বস্তু থেকে এ কথাও জানা গেল যে,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি নভোমণ্ডলের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা, (শুধু তাই নয়) বিশ্ব-জগতেরও পালনকর্তা। গৌরব তাঁরই (যার আলামত প্রকাশ পায়) আকাশে ও পৃথিবীতে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً—جثو এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كل امة (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। কোন কোন আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়; কেননা অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গম্বর ও সৎ লোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। كل শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جاثية এর অর্থ করেছেন নামাযে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোন খটকা থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসা---ভয়ের নয়।

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا——অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। তাকে বলা হবে, اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا——অর্থাৎ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহবান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহবান করা।

سورة الاحقاف

সূরা আহ্কাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪ রুকূ, ৩৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا
يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا
حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হা-মীম, (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথ-ভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪) বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ

আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। (৬) যখন মানুষকে হাশরে একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (-এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন), এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (তাই এর বিষয়বস্তু অনুধাবনযোগ্য। অতপর তওহীদ ও পরকাল বর্ণিত হয়েছে,) আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু প্রজ্ঞা সহকারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। যারা কাফির, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয় (যেমন তওহীদ না মানলে কিয়ামতে তোমাদের আযাব হবে), তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (এবং ভ্রূক্ষেপও করে না)। আপনি (তাদেরকে তওহীদ সম্পর্কে) বলুন, বল তো, আল্লাহ্‌র (তওহীদের) পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, (তাদের পূজনীয় হওয়ার কি দলীল আছে। যুক্তিভিত্তিক দলীল থাকলে) আমাকে দেখাও যে, তারা কোন্ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশ সৃজনে তাদের কোন্ অংশ আছে? (বলা বাহুল্য, তোমরাও তাদেরকে স্রষ্টা স্বীকার কর না, যা পূজনীয় হওয়ার দলীল হতে পারে, বরং সৃষ্টই বলে থাক, যা পূজনীয় হওয়ার পরিপন্থী। সুতরাং যুক্তিভিত্তিক দলীল তো নেই। যদি তোমাদের কাছে ইতিহাস-ভিত্তিক দলীল থাকে, তবে) এর (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্ববর্তী কোন (বিশুদ্ধ) কিতাব আমার কাছে উপস্থিত কর (যাতে শিরকের আদেশ রয়েছে। কেননা, তোমরাও জান যে, কোরআনে শিরকের খণ্ডন রয়েছে। সুতরাং অন্য কোন কিতাবের দরকার হবে।) অথবা (যদি কিতাব না থাকে, তবে) কোন (নির্ভরযোগ্য) পরম্পরাগত জ্ঞান (যা কিতাবে লিখিত হয়নি; বরং মৌখিক) আন—যদি তোমরা (শিরকের দাবিতে) সত্যবাদী হও। (উদ্দেশ্য এই যে, ইতিহাসভিত্তিক দলীলটি সমর্থনযোগ্য ও সনদসহ হওয়া দরকার, যেমন কোন নবীর কিতাব অথবা তার মৌখিক উক্তি হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও যারা মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে না, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,) তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, (যে দলীল দিতে অক্ষম হওয়া এবং বিপক্ষে দলীল কায়েম থাকা সত্ত্বেও) আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না এবং যে তার পূজারও খবর রাখে না? অতপর যখন (কিয়ামতে) সমস্ত মানুষকে (হিসাবের জন্য) একত্র করা হবে, তখন তারা (অর্থাৎ উপাস্যরা) তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে। (সুতরাং এমন

উপাস্যদের উপাসনা করা নিতান্তই ভুল, যাদের উপাসনা করার কোন যুক্তি নেই এবং উপাসনা না করার যথেষ্ট কারণ মজুদ রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ—এসব আয়াতে মুশরিকদের দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবির সপক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলীলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোন প্রকার দলীল নেই। তাই এহেন দলীলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. যুক্তিভিত্তিক দলীল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছেঃ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ—দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাসভিত্তিক দলীল। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, কোরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী ও রসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছেঃ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا—অর্থাৎ তোমাদের মূর্তি পূজার কোন দলীল থাকলে কোন ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রসূলগণের পরম্পরাগত কোন উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

أَثَارَةٌ—শব্দটি سَمَاحَةٌ ও شَجَاعَةٌ--এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল এর তফসীরে 'পয়গম্বরগণ থেকে রেওয়ায়েত' বলেছেন।---(কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্তিক দলীল গ্রহণযোগ্য---কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উক্তি। আয়াতে أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরও কিছু তফসীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ
افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ
فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٨
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠

(৭) যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাফিররা বলে এ তো প্রকাশ্য যাদু। (৮) তারা কি বলে যে, রসূল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি তবে তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা আলোচনা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী-ইসরাইলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে তোমাদের চেয়ে অবিবেচক আর কে হবে? (১১) নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আমার (রিসালতের দলীল) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে (অর্থাৎ রিসালত অমান্যকারীদেরকে) পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর

কাফিররা বলে, এটা প্রকাশ্য যাদু। (অথচ যাদুর মতন যাদু হতে পারে; কিন্তু এসব আয়াতের অনুরূপ আয়াত কেউ রচনা করতে পারে না। এটাই তাদের উক্তির অসারতা প্রমাণের প্রকাশ্য দলীল।) তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ আপনি) একে (অর্থাৎ কোরআনকে) নিজে রচনা করে (আল্লাহ্‌র কোরআন বলে) অভিহিত করেন? আপনি বলে দিন, যদি আমি রচনা করে থাকি (আর আল্লাহ্‌র নামে চালু করে থাকি,) তবে (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রীতি অনুযায়ী মানুষকে প্রতারণা থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা নবুয়ত দাবির অপরাধে আমাকে শীঘ্রই ধ্বংস করে দেবেন। ধ্বংস করার, সময়) তোমরা (অথবা অন্যরা) আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়তের মিথ্যা দাবির কারণে শাস্তি হওয়া অপরিহার্য। কেউ এ শাস্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। এটাই এ বিষয়ের দলীল যে, আমি নবুয়ত দাবিতে মিথ্যাবাদী নই। অতএব মনে রেখো,) তোমরা কোরআন সম্পর্কে যা আলোচনা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত (তাই তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন)। আমার ও তোমাদের মধ্যে (সত্যমিথ্যার ফয়সালার জন্য) তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (অর্থাৎ খবরদার! আমি মিথ্যাবাদী হলে আমাকে শাস্তি দেবেন ও তোমরা মিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরকে শীঘ্র অথবা বিলম্বে আযাব দেবেন। যদি তোমরা মনে কর যে, নবুয়ত দাবিকারীর উপর আযাব না আসা যেমন তার সত্যতার দলীল, তেমনি তোমাদের উপর আযাব না আসাও তোমাদের সত্যতার দলীল, তবে এর জওয়াব এই যে,) তিনি ক্ষমাশীল, (তাই দুনিয়াতে কাফিরদের উপর আযাব না আসা যে এক প্রকার ক্ষমা, সে ক্ষমাও তিনি করেন এবং) দয়াময় (তাই ব্যাপক দয়া কাফিরদের প্রতিও করেন। অতএব কাফিরদের উপর দুনিয়াতে আযাব না আসা তাদের সত্যতার দলীল নয়। পক্ষান্তরে নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার আর আযাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, মিথ্যা নবুয়ত দাবির পরেও আযাব না দেওয়া মানুষকে পথভ্রষ্টতায় ঠেলে দেওয়ার নামান্তর)। আপনি বলুন, আমি কোন অভিনব রসূল নই (যে, তোমরা আশ্চর্য বোধ করবে। আমার পূর্বে অনেক রসূল আগমন করেছেন, যা লোক পরম্পরায় তোমরাও শুনেছ। এমনিভাবে আমি কোন বিস্ময়কর দাবিও করি না, যেমন আমি বলি না যে, আমি অদৃশ্যের খবর জানি। বরং আমি নিজেই বলি যে, অদৃশ্যের খবর ততটুকুই জানি, যতটুকু ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্য কিছু জানি না। এমনকি,) আমি জানি না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। (সুতরাং আমি যখন নিজের ও তোমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানার দাবি করি না, তখন অদৃশ্যের বিষয়াদি জানার দাবি কিরূপে করব? তবে ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছি, তা নিজের সম্পর্কে অথবা অপরের সম্পর্কে অথবা ইহকাল ও পরকালের অবস্থা সম্পর্কে হলেও তা অবশ্যই পরিপূর্ণ। সেমতে বলা হয়েছে,) আমি (জ্ঞান ও কর্মে) কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। (তোমরা তা না মানলে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ নই। (অতপর নিজে কোরআন

রচনা করার উপরোক্ত অভিযোগ বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে,) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা একে অমান্য কর এবং (এই দলীল দ্বারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়া জোরদার হয় যে,) বনী ইসরাইলের (আলিমদের মধ্যে) একজন (আলিম) সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা (তা জানা সত্ত্বেও) অহংকার কর, তবে তোমাদের অপেক্ষা অধিক অবিবেচক আর কে হবে? (অবিবেচকদের অবস্থা এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিবেচকদেরকে (তাদের হঠকারিতার কারণে) পথ প্রদর্শন করেন না (তারা সর্বদা পথভ্রষ্টতায় থাকে এবং পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ—وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

আয়াতে إِنْ أَتَّبِعُ । বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তফসীরবিদ যাহ্‌হাক এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মু'মিন ও কাফিরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক—তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে ঃ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ —জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলার মত নই এবং এসব জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি।

তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রসূলুল্লাহ্ (সা) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেন নি, যতদিন আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে

ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদবঃ এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন, যা অন্য কোন পয়গম্বরকে দেন নি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে---পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়! কেননা, পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মু'মিন জান্নাতে যাবে এবং কাফির জাহান্নামে যাবে।—(কুরতুবী)

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ أَوَلَمْ يَكُن

لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ — —এ আয়াতের এবং সূরা শু'আরার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও খৃস্টান রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র রিসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাইলের অনেক আলিম তাদের কিতাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলিমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্য যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান, তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যখন তোমাদের বনী ইসরাইলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব, অতপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জিদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাইলের কোন বিশেষ আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাইলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদী আলিম হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামসহ যত ইহুদী ও খৃস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

(১২) আর কাফিররা মু'মিনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দীন ভাল হত, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১৩) এর আগে মূসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কাফিররা মু'মিনদের (ঈমান আনা) সম্পর্কে বলে, যদি এটা (অর্থাৎ কোরআন) ভাল (অর্থাৎ সত্য) হয়, তবে তারা (অর্থাৎ নীচ লোকেরা) আমাদের থেকে এগিয়ে যেতে পারত না। (অর্থাৎ আমরা খুব বুদ্ধিমান আর তারা নির্বোধ, ভাল বিষয়কে বুদ্ধিমানরা প্রথম গ্রহণ করে। কাজেই কোরআন সত্য হলে আমরাই আগে গ্রহণ করতাম। কাফিরদের এই উক্তি তাদের চরম ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক)। যখন (হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে) তারা কোরআনের মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন (জিদের বশবর্তী হয়ে) শীঘ্রই বলবে, (পৌরাণিক মিথ্যা কাহিনীগুলোর মত) এ-ও এক পৌরাণিক মিথ্যা। এর (অর্থাৎ কোরআনের) আগে মূসার কিতাব (নাযিল হয়ে) ছিল, যা (তার উম্মতের জন্য) পথপ্রদর্শক, (এবং বিশেষভাবে মু'মিনদের জন্য) রহমত ছিল। (তওরাতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে) এটা (তেমনি) এক কিতাব যা তাকে (অর্থাৎ তার ভবিষ্যদ্বাণীকে) সত্যায়ন করে, আরবী ভাষায় যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎলোকদেরকে সুসংবাদ দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ—অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফিরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য!

ইবনে মুনযির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নাম্নী এক বাঁদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাঁদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কুরাইশ কাফিররা বলত, ইসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাঁদী আমাদেরকে পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً—এ আয়াত থেকে প্রথমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে মূসা (আ) রসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তওরাত নাযিল হয়েছিল। ইহুদী ও খৃস্টান কাফিররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়ত এতে شَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা, মূসা (আ) ও তওরাত রসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ
اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ
وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝١٥ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ
مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۭ وَعْدَ الصِّدْقِ
الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝١٦ وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ
اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ
اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ڰ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ۝١٧ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝١٨ وَلِكُلٍّ
دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝١٩
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ
بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُوْنَ ۝٢٠

(১৩) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (১৪) তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (১৫) আমি

মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল হে আমার পালনকর্তা আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর যাতে আমি তোমার নিয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। (১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে বলে, ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে খবর দাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিতামাতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার, তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (১৮) তাদের পূর্বে যে সব জ্বিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (১৯) প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেওয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (সত্যমনে) বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী তওহীদ মেনে নেয়), অতপর (তাতেই) অবিচল থাকে (অর্থাৎ তা ত্যাগ করে না,) তাদের (পরকালে) কোন ভয় নেই, এবং তারা (সেথায়) চিন্তিত হবে না। তারা জান্নাতের অধিকারী, তথায় চিরকাল থাকবে সেই কর্মের প্রতিফল-স্বরূপ, যা তারা করত (অর্থাৎ উল্লিখিত ঈমান আনা ও তাতে অবিচল থাকা। আল্লাহ্‌র এ সমস্ত হকের ন্যায় আমি বান্দার হকও ওয়াজিব করেছি। তন্মধ্যে একটি প্রধান হক হচ্ছে পিতামাতার হক। তাই) আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি (বিশেষত মাতার সাথে বেশি। কেননা) তার মাতা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করা ও তার স্তন্য ছাড়ানো (প্রায়ই) ত্রিশ মাসে হয়। (এতদিন পর্যন্ত মাতা নানা রকম কষ্ট ভোগ করে। এসব কষ্টে পিতাও কম বেশি শরীক হয়, বরং

অধিকাংশ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পিতাকেই করতে হয়। উভয়ের আরামেই সমান বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ কারণেই মানুষের উপর পিতামাতার হক অপরিহার্য ও ওয়াজিব করা হয়েছে। মোটকথা, এরপর সন্তান ক্রমশ বড় হতে থাকে।) অবশেষে যখন যৌবন (অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে) পৌঁছে যায় এবং (প্রাপ্ত বয়সের পর এক সময়) চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন (ভাগ্যবান হলে) বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন। (পিতামাতা মুসলমান হলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামতই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় কেবল ইহলৌকিক নিয়ামত বোঝানো হয়েছে। পিতামাতার নিয়ামতের প্রভাব সন্তানের উপরও প্রতিফলিত হয়। সেমতে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব একটি ইহলৌকিক নিয়ামত। এরই দৌলতে সন্তানের অস্তিত্ব হয়ে থাকে। আর তাদের পারলৌকিক নিয়ামতের প্রভাব এই যে, তাদের শিক্ষা ও লালন-পালন সন্তানের জ্ঞান ও কর্মের উপায় হয়ে থাকে। সে আরো বলে) যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করি এবং আমার সন্তানদেরকেও (আমার উপকারার্থ) সৎকর্মপরায়ণ করুন (চোখে দেখে আনন্দ লাভ করা ইহলৌকিক উপকার এবং সওয়াব পাওয়া পারলৌকিক উপকার।) আমি আপনার প্রতি (গোনাহ্ থেকেও) তওবা করলাম এবং আমি আপনার আজ্ঞাবহ। (এর উদ্দেশ্য দাসত্ব স্বীকার করা। অতপর এ দোয়ার ফল বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এমন লোকদের সৎকর্মগুলো কবুল করব এবং তাদের মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করব। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত হবে সে সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে (দুনিয়াতে) দেওয়া হত। (অতপর জালিম ও হতভাগাদের কথা বলা হয়েছে,) আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করেছে; যেমন তার এই অবস্থা থেকে জানা যায় যে, সে) তার পিতামাতাকে বলে, (যাদের হক আদায় করতে সর্বাধিক তাকীদ রয়েছে, বিশেষত যখন তারা মুসলমান হয় এবং তাকেও মুসলমান হতে বলে) ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে এই ওয়াদা (অর্থাৎ খবর) দাও যে, আমি (কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে) কবর থেকে উত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে অনেক সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, (যাদেরকে প্রতি যুগে তাদের পয়গম্বরগণ এ কথাই বলত, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছুই প্রকাশ পেল না? এতে বোঝা গেল যে, এগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা।) আর তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতামাতা তার এই কুফরী কথাবার্তা শুনে অস্থির হয়ে) আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে (এবং খুব দরদ সহকারে তাকে বলে,) আরে দুর্ভোগ তোর, তুই ঈমান আন (এবং কিয়ামতকেও সত্য মনে কর।) নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। তখন (এরপরও) সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (উদ্দেশ্য, সে এমন হতভাগা যে, কুফর ও পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার উভয় গোনাহেই লিপ্ত। পিতামাতার বিরোধিতা তো করেই—কথাবার্তায়ও ধৃষ্টতা দেখায়। অতপর এসব কুকর্মের ফল বর্ণিত হয়েছে,) তাদের পূর্বে যেসব (কাফির) জ্বিন ও মানুষ গত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও আল্লাহ্র শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা (সবাই) ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (অতপর উপরোক্ত বিশদ বর্ণনার সারবস্তু

সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত উভয় দলের মধ্য থেকে) প্রত্যেকের (অর্থাৎ প্রত্যেক দলের) জন্য তাদের (বিভিন্ন) কর্মের কারণে আলাদা আলাদা স্তর (কারও জান্নাতের স্তর এবং কারও জাহান্নামের স্তর) রয়েছে (এ কারণে,) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। আর তাদের প্রতি (কোন প্রকার) অবিচার করা হবে না। (উপরে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সৎকর্মীদের প্রতিদান জান্নাত। কিন্তু জালিমদের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি, কেবল সংক্ষেপে كَانُوا خَاسِرِينَ এবং حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ বলা হয়েছে। তাই অতপর তাদের আযাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সেদিনটি স্মরণ-যোগ্য—) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে (এবং বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখের সামগ্রী পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। এখানে তোমরা কোন সুখের সামগ্রী পাবে না।) এবং সেগুলো ভোগ করেছ, (এমনকি তাতে মগ্ন হয়ে আমাকেও ভুলে গিয়েছিলে,) সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাবের শাস্তি দেওয়া হবে। (সে মতে শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম এবং অপমান হচ্ছে ধিক্কার ও তিরস্কার।) কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে (অর্থাৎ এমন অহংকার করতে, যা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখত। এরূপ অহংকারই চিরকালীন আযাবের কারণ।) এবং তোমরা পাপাচার করতে (এতে কুফর, ফিস্ক ও সর্বপ্রকার জুলুম অন্তর্ভুক্ত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালিমদের জন্য শাস্তিবাণী এবং মু'মিনদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য প্রথম দু'আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا—আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। رَبُّنَا اللَّهُ বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং اِستقامة শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। اِستقامة-এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সিজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী চার আয়াতে মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সন্তানের জন্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌঁছার পর মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের

সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবাযত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহ্‌র তওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবূল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, মানুষ তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হল পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তফসীরে মাযহারীতে وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ বাক্যে الانسان -এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা)। বলা বাহুল্য, কোরআনের কোন আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত আবূ বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বিশেষ গুণাবলী তাঁরই গুণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবূ বকর আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলী হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا — وصية শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং احسان -এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবাযত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا — كره শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা মানুষ কোন কারণবশত সহ্য করে থাকে এবং كره--এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই اكراه শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি

হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশিঃ আয়াতের শুরুতে পিতামাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভ ধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্য লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরী হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেনঃ صل امک ثم امک ثم امک ثم ابای ثم ادناک فادناک অর্থাৎ মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতপর মাতার সাথে, অতপর মাতার সাথে, অতপর পিতার সাথে, অতপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا—এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ্ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রা) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভ ধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভ ধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া। হযরত আলী (রা) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।—(কুরতুবী)

এ কারণেই সমস্ত আলিম একমত যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয়মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্ন রূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মতভেদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইমাম মালেক থেকে চার বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর। (মাযহারী) স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত। অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ'মাস স্তন্যদানের অনুমতি রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তন্যদানের দু'বছরের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম।

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً--اشد--এর শাব্দিক অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। সূরা আন'আমে এর তফসীর করা হয়েছে 'প্রাপ্তবয়স' বলে। এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতপর بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً-কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَبَلَغَ اَشُدَّهٗ উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভ ধারণ, অতপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্ত-বয়স্ক ও শক্তিশালী হল এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে স্রষ্টা ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তওফিক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে

লাগল ঃ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। এ কারণেই তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরতুবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলীল। সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা(রা)-র অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবূ বকর (রা) সে সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ أَشُدَّهُ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করলেন। তখন আবূ বকর (রা)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন তিনি উল্লিখিত দোয়া করলেন। আয়াতে بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً—বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ—দোয়াও কবূল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফিরের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে, মুক্ত করার তওফিক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي--কবূল

হয়। বস্তুত তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করে নি। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা সবাই রসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তফসীরে রূহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কুহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতামাতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল? জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। (রূহুল মা'আনী) এই তফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবূ বকরের বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ্ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় পুরাপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত উসমান (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মু'মিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌঁছালে সে আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়ার তওফিক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌঁছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌঁছালে আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে أسير الله فى الارض লিখে দেন। অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র কয়েদী। —(ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, হাদীসে সে মু'মিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ

—অর্থাৎ উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত মু'মিন-মুসলমানের সৎকর্মসমূহ কবূল করে নেওয়া হয় এবং গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবূ বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রা)-র নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেব বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে

আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত উসমান (রা)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন ঃ

كان عثمان رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم اولائك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى اصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون قال والله عثمان واصحاب عثمان رضى الله عنهم قالها ثلاثا ـ

অর্থাৎ হযরত উসমান (রা) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্র কসম! উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—(ইবনে কাসীর)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا—পূর্বের আয়াতসমূহে মাতাপিতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটূক্তি করে। বিশেষত পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) মারওয়ানের এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন সহীহ্ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا——অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়, পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফিররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল

হয়ে থাকে। মু'মিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধনসম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা ঃ আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফিরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুআয (রা)-কে ইয়ামেন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন ঃ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছ থেকে অল্প রিযক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান।---(মাযহারী)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۗ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ
مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ۖ
وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ
عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا
اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ
رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا
وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا
أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

(২১) 'আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও তা নিয়ে আস। (২৩) সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। (২৪) (অতপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি 'আদ সম্পদায়ের ভাইয়ের [অর্থাৎ হুদ (আ)-এর] কথা স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় (দর্শকদের স্মৃতিতে বিষয়টি উপস্থিত করার জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে) এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। (করলে তোমাদের উপর আযাব নাযিল হবে। এটা এমন জরুরী ও খাঁটি কথা যে,) তার (অর্থাৎ হুদের) পূর্বে ও পরে (এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে) অনেক সতর্ককারী (পয়গম্বর এ পর্যন্ত) গত হয়ে গেছেন। [আশ্চর্য নয় যে, হুদ (আ) সম্প্রদায়ের কাছে একথাও প্রকাশ করেছিলেন যে, সতর্ককারীরা সবাই তওহীদের দাওয়াতে একমত ছিলেন। দাওয়াতের বিষয়বস্তু জোরদার করার জন্য وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ বাক্যটি মাঝখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। হুদ (আ) আরও বলেছিলেন,] আমি তোমাদের জন্য এক মহা (কঠিন) দিবসের শাস্তির আশংকা করি (এ থেকে বাঁচতে হলে তওহীদ কবুল করে নাও)। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেবদেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? অতএব (আমরা তো নিবৃত্ত হব না, তবে) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দিচ্ছ, তা বাস্তবায়িত

কর। তিনি বললেন, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে (যে, আযাব কবে আসবে।). আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। (তন্মধ্যে আমাকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসবে। আমি তা বলে দিয়েছি, এর বেশি আমার জানাও নেই, ক্ষমতাও নেই।) কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। (একে তো তওহীদ স্বীকার কর না, তদুপরি বিপদ ত্বরান্বিত করতে চাও এবং আমাকেও তা এনে দিতে আদেশ কর। মোটকথা তারা যখন কিছুতেই সত্যকে কবুল করল না, তখন আযাবের প্রস্তুতি এভাবে শুরু হল যে, প্রথমে একটি মেঘখণ্ড উঠল,) যখন তারা মেঘখণ্ডকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল। তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (আল্লাহ্ বলেন,) না, (এটি বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ নয়) বরং এটি সে শাস্তি, (যে শাস্তি শীঘ্র নিয়ে আস বলে) যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এতে (এই মেঘখণ্ডে) রয়েছে এক বায়ু, যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব। সে সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে তার পালনকর্তার আদেশে। অতপর (সে বায়ু মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে শূন্যে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করল। ফলে) তারা এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই (অর্থাৎ মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার) দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধীদেরকে এমনিভাবে সাজা দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে (অর্থাৎ 'আদ সম্প্রদায়কে) এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। (অর্থাৎ দৈহিক ও আর্থিক শক্তির উপর নির্ভরশীল কাজকর্ম।) আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, এ কারণে তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না এবং তাদেরকে সে শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করত (অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয় তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না, হৃদয়ের অনুভূতিপ্রসূত কৌশল ও দৈহিক শক্তিও তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। সুতরাং তোমাদের কি শক্তি আছে)!

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا
اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২৭) আমি তোমাদের আশেপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বারবার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। (২৮) অতপর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আয়াতসমূহের যোগসূত্র ঃ (উপরে 'আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে)।

আমি তোমাদের আশেপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি (যেমন, সামূদ ও লূতের সম্প্রদায়। মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামেন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত ছিল। তাই مَا حَوْلَكُمْ বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্য) বারবার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতপর আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্য উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল (ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ তাদেরেকে উপাস্য ও সুপারিশ-কারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয় (বাস্তবে তারা উপাস্য ছিল না)।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا
حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾
قَالُوا يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ
أَجِيبُوا دَاعِىَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْأَرْضِ
وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُولَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

(২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। (৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্ মার্জনা করবেন। (৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের কাছে সে সময়কার কাহিনী আলোচনা করুন,) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। তারা (শেষ পর্যন্ত এখানে পৌঁছে) কোরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা কোরআনের কাছে (অর্থাৎ কোরআন পাঠের জায়গায়) উপস্থিত হল, তখন (পরস্পর) বলল, চুপ থাক (এবং এই কালাম শোন।) অতপর যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হল (অর্থাৎ নামাযে পয়গম্বরের যতটুকু পড়ার ছিল, পড়া হয়ে গেল,) তখন তারা (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং) তাদের সম্প্রদায়ের কাছে (এই সংবাদ পৌঁছানোর জন্য) ফিরে গেল। তারা (ফিরে গিয়ে) বলল, ভাইসব, আমরা এক (আশ্চর্য) কিতাব শুনেছি, যা মূসা (আ)-র পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে এবং সত্য (ধর্ম) ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (অতপর সত্য ধর্ম ইসলাম কবুল করার জন্য প্রথমে প্রেরণা যুগিয়ে ও পরে ভয় দেখিয়ে আদেশ করা হয়েছে।) ভাইসব, তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর (অর্থাৎ কোরআনের অথবা পয়গম্বরের আদেশ পালন কর। কথা মান্য করা অর্থ,) তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর (এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে ঈমানের দিকে আহ্বান করে—কোন জাগতিক স্বার্থের দিকে নয়। তোমরা এরূপ করলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করে আল্লাহ্‌কে) অপারগ করতে পারবে না, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করতে পারবেন না তা নয়।) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না (যে তাকে বাঁচাতে পারে।) এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত (সে প্রমাণাদি সত্ত্বেও সত্যের দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কার কাফিরদেরকে শোনানোর জন্য পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কোরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! জিনদের কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ্ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হিজাযেও পৌঁছাল। সেদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর "ওকায" বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহু লোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফযরের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌঁছাল। তারা কোরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। ---(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌঁছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কোরআন শোন। রসূলুল্লাহ্ (সা) নামায শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্ত কার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ---(ইবনুল-মুনযির)

আরও এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত

জিন ইসলাম গ্রহণের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়।---(রূহুল মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বারবার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্র করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।---(বয়ানুল-কোরআন)

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ---"মূসার পরে" বলার কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা মূসা (আ)-র পর ঈসা (আ)-র প্রতি যে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জিলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কোরআন তওরাতের মত একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

مِنْ—يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ অব্যয়টি আসলে "কোন কোন"-এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্র হক মাফ হবে---বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ مِنْ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هَٰذَا
بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا

تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ
يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

(৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৪) যে দিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে। (৩৫) অতএব আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি (কিয়ামতে) মৃতদেরকে জীবিত করতে (আরও উত্তমরূপে) সক্ষম? নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (এতে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হল।) আর যেদিন (কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং) কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (এবং জিজ্ঞাসা করা হবে---)

এটা (অর্থাৎ জাহান্নাম) কি সত্য নয়? (তোমরা দুনিয়াতে এর বাস্তবতা অস্বীকার করতে এবং وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ বলতে।) সেদিন তারা বলবে, আমাদের পালনকর্তার কসম, নিশ্চয় এটা সত্য। আল্লাহ্ বলবেন, (জাহান্নামের) আযাব আস্বাদন কর। কারণ তোমরা (জাহান্নাম অস্বীকার করতে এবং) কুফরী করতে। [অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা যখন জানা গেল,] অতএব আপনি সবর করুন যেমন, অসীম সাহসী পয়গম্বগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে (আল্লাহ্র শাস্তিদানে) তড়িঘড়ি করবেন না। (মুসলমানদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের দ্রুত আযাব কামনা করতেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আযাবের পাত্র কাফিররা স্বয়ং আযাব ত্বরান্বিত করতে চাইত। বাদী যদি বিবাদীর দ্রুত শাস্তি কামনা করে, তবে তা বোধগম্য ব্যাপার কিন্তু বিবাদী নিজেই নিজের শাস্তি দ্রুত চাইলে তা অবাক কাণ্ড বৈ কি! আল্লাহ্

রহস্যের কারণে তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি হবে না ঠিক, কিন্তু কিয়ামতে আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় তাৎক্ষণিক আযাবের মতই মনে হবে। কেননা,) ওদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেওয়া হয়, ওরা যেদিন সে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (শাস্তির তীব্রতার কারণে) তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি (দুনিয়াতে) অবস্থান করেনি। অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘ সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত মনে হবে এবং তাৎক্ষণিক আযাব এসে গেছে বলেই মনে হবে। অতপর কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে) এটা সুস্পষ্ট অবগতি যা [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে গেছে।] সুতরাং (এরপর) তারাই বরবাদ হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (কেননা, অবগতির পর কোন ওযর আপত্তি শোনা হবে না। এতে রসূলের কোন ক্ষতি নেই। এভাবে এ বাক্যেও রসূলের জন্য অতিরিক্ত সান্ত্বনা রয়েছে)।

যাদের সহযোগিতায় গ্রন্থখানি সংগৃহীত হয়েছে তাদের আখেরাতের কল্যাণের জন্য দয়া করে একটু দোয়া করবেন।